Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.1
Pages	1-15
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) প্রথম কাব্যেই (খসড়া, ১৩৪৫) বিশ্ব-পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। যদিও বলছেন "আছি বাংলাদেশে অফিসে নিযুক্ত বঙ্গবাসী"[১] তবু "এক দৃষ্টি"তে "পোর্ট স্যুদান"; "ট্রেনে চড়ে কালের জগৎ মধ্য এশিয়ায় ছোটে"[২]; "চলো সেই চেনা পথে পথে এডেন পেরিয়ে"[৩]। বস্তুতঃ আজীবন "চলন্ত" তিনি। রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে ছিলেন এবং অনুশীলনী কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রানুকরণে ছিলেন নিষ্কুণ্ঠ। 'কবিতা সংগ্রহের' পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছে ঐসব রচনার কিছু। কিন্তু প্রথম কাব্যের নাম যদিও 'খসড়া', রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর দৃষ্টিকে আড়াল করে নেই। ঐ কাব্যেই আছে এই অসম্ভব চরণ: "চাঁপার কলিতে, কবি, ধরো অণুবীক্ষণ যন্ত্র"[৪]।

দ্বিতীয় কাব্য 'এক মুঠো' (১৩৪৬) উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে[৫]। প্রথম কবিতা "বাস্তবিক"-এ চিনিয়ে দিচেছন তাঁর বৈশিষ্ট্য: যতি চিহ্নের প্রাচুর্য; ছোট---খুবই ছোট বাক্য: "ফুলকে ছোঁবো। দেখবো। এক হব মাধুরীর ডুবে"; অনির্দিষ্ট চরনান্তিক মিল: যেমন প্রথম পাঁচ চরণে শুধু দ্বিতীয় আর তৃতীয় চরণে মিল আছে---"ফোটায়"---"বোটায়"; কিন্তু অকস্মাৎ অন্তর্মিল---যেমন পঞ্চম চরণে---"বনের, আমার মনের মিলিত যৌবনের।" দ্বিতীয় কবিতা "মাঙ্গলিকে"র অতিক্ষীণ দৈর্ঘ্যের প্রথম ছয় চরণে পাঁচটি বাক্য। এবং প্রথম বাক্যে ঘোষণা "আছি এখন মার্স-এ"। অর্থাৎ বিশ্ব ছাড়িয়ে মহাবিশ্বে। সেখানে চারিদিকে নীল আয়ু / আদিম বায়ু"তেও মনে পড়ছে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের দৈনন্দিনতা:

> বারান্দায় বই পড়া; গর্ব---পৃথিবী বিশ্বের ধারিণী, এই বোধ;
> হস্তি হিরণ্য অশ্ব, চিরন্তন পলিটিক্স্, বাঙালী ইংরেজ
> জীবাত্মা পরমাত্মা, শঙ্খশুক্তিমকর, বিদ্যুতের তেজ
> ঠাণ্ডা আলমারিতে। (কবিতা সংগ্রহ ১, পৃ. ৪২)

সুতরাং "হঠাৎ জাগল রুচি": "এখানে কই / রেফ্রিজরেটরের দই।"

এ কাব্যে "বৃষ্টি" কবিতায় যেমন আছে মনোলীনতা: "অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে"; তেমনি "চেতন স্যাকরায়" আছে শ্রমজীবীর বাস্তবতা:

> গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
> সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
> ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।
> ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর " (ক. স. ১, পৃ. ৫৬)

এই পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ আরো বর্ণনা এবং এখানে বেড়ে ওঠা শিশুর কথা এবং কল্পনা: "বুঝিবা কোথাও যাবো, যাবোই"—। কিন্তু না। "কোথাও যাবে না, গলিতেই

থাকবে।" এবং

বড়ো রাস্তায় যাদের বাসা
হাঁ ক'রে দেখবে তাদের মোটর, পনেরোটা বেড়াল,
শখের চাকর—থাকবে খাসা ;

কেউ ছোঁবে না তাদের ঘোড়-দৌড়, মদ-পাশা ;
দারোয়ানের লাঠি
বাঁচাবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্দুক ; একটু ঈর্ষা করবে,
দীর্ঘশ্বাস, তবু তাদের চাটবে মাটি
চাকরির রাস্তায়। (ক. স. ১, পৃ. ৫৭)

মুক্তিপথ জানা নেই চেতন স্যাকরার।

নই নৈতিক পল্টন, সভার বক্তা ইত্যাদি।
শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন লাগলে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।

বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে 'চেতন'কে সরিয়ে বেজে উঠছে অমিয় চক্রবর্তীর চেতনার স্বর। "মহা-পৌরুষে" উঠে আসছে সুপরিচিত অন্য এক চরিত্র :

···পলিটিক্সে সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ, দরজা জুড়ে থাকে
আর্টে, উপবনে তপোবনবিহারী, সাহিত্যে গদাধারী : (ক.স ১, পৃ. ৫৯)

এ সব কবিতা থেকেই অমিয় চক্রবর্তীর আর এক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা নাট্যিক মুহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে তিনি পরিবেশ, ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার তালিকা তৈরী করেন ; নেপথ্যে থাকে কখনো ব্যঙ্গ, কখনো ক্রোধ।

খোঁজো ধারা। ধরো দান্তের ইস্পাতী দৃষ্টি, ধ্যানের ইরানী
নীল গম্বুজ, রবীন্দ্রনাথের, "প্রাণগঙ্গা" কবিতা ;
সোভিয়েট কল্পনা, পাশ ক'রে জলপানি,
মোঘল বাগান, হিন্দুকুশ, টেলিভিশন, প্রসন্ন মধ্যবিত্ত ঘর,
চাঁপা গাছ, মিকি মাউস্,
যথাস্থানে চরখা, বিশেষভাবে কলের প্রয়োগ,
স্বদেশী সিল্ক্ হাউস্ ;
খবরের কাগজের মিথ্যে-ছুট সকালবেলা, কংগ্রেসের কর্মী
ঋষির ঋষিত্ব পিসীর পিসীত্ব—সবের মধ্যে প্যাটার্ণ মনুষ্যধর্মী।
(যুদ্ধের খবর, ঐ, পৃ. ৬৫)

"মাটির দেয়াল" (১৩৪৯)-এ তালিকা পদ্ধতির অসামান্য সাফল্য দেখি "বড়বাবুর কাছে নিবেদন" কবিতায়। এখানে নির্বাসিত কেরানী নিবেদন করছে তার কি কি বড়বাবু কেড়ে নিতে পারবে না। প্রথম তিন চরণ অমিল

তালিকা প্রস্তুত
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরানী :

এই অংশটুকু প্রস্তাবনা। তারপর যেই তালিকা শুরু হল অমনি অসম চরণের প্রায় গদ্য-বাক্যে অন্তমিল এসে সচকিত করে তুলল :

বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব,
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাক্রের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো।
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো,
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বই এর দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপনজনকে ভালবাসা
বাঙলার স্মৃতি দীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা। (ক.স. ১, পৃ. ৭৭-৭৮)

"অভিজ্ঞান বসন্তে" (১৩৫০) বিশ্ব পরিভ্রমণ মুখ্য হয়েছে প্রদক্ষিণ অংশের কবিতাগুলিতে —"চমন", "ইরান", "চীনে বুড়ো", "বামিয়ান", "হাইফা", "উর্বশী", "সৌখিন ভ্রমণ"—জাভা, মালয়, উত্তর চীন। অকস্মাৎ উন্মূল মনে হচ্ছে নিজেকে, পৃথিবীর সচলতার সংগে তুলনা করছেন নিজের চলাকে।

তোমারও নেই ঘর
আছে ঘরের দিকে যাওয়া। ...

গাছ বীজ হাড় স্বপ্ন আশ্চর্য জানা
এবং তোমার আহ্নিক অমোঘ আবেদন
আবর্তন

নিয়ে
কোথায় চ'লেচ পৃথিবী।
আমারও নেই ঘর।
আছে ঘরের দিকে যাওয়া ।।
(কোথায় চলেছ পৃথিবী, পৃ. ১০৮)

অসাধারণ এই উচ্চারণ। ক্রমাগত ঘরের দিকে যাওয়া, এই আত্মানুসন্ধানই অমিয় চক্রবর্তীর চিরযাত্রী চৈতন্যের বিশিষ্ট পরিচয়।

এই কাব্যের "সূর্য খণ্ডিত ছায়া" অংশের "সংগতি" কবিতাটিতে অমিয় চক্রবর্তী তার ক্ষুদ্র বাক্য ও তালিকা কৌশলের সংগে মাত্রাবৃত্তে অসমমাত্রার চরণ বিন্যাসের অপূর্ব সংগতি স্থাপন করে নিটোল কাব্যোৎকর্ষে উপনীত হয়েছেন।

কবিতার আটটি অংশে অষ্টাধিক গুচ্ছ বৈপরীত্য "মেলাবেন"—এই ভবিষ্যগর্ভ অনির্ণেয় সদিচ্ছার সুতোয় গাথা। উল্লেখযোগ্য, কবিতায় কোন স্তবক ভাগ নেই, কিন্তু অংশগুলো সুস্পষ্ট। প্রথমাংশের নাটকীয় সূচনায় :

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

"হাওয়া" এবং "বাড়ি"র বিশেষণ "ঝোড়ো"—"পোড়ো"র অন্তমিল বর্ণিত পরিস্থিতির অমিলেও মিলের সম্ভাব্যতাকে যেন বিশ্বাস্য করে তুলতে চাইছে। দ্বিতীয়াংশে :

পাগল ঝাপটে দেবেনা গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা,
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
 বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
 প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
  মেলাবেন।

তিনটি সমিল ৬/৬/২ চরণে দুঃসহ খরার বর্ণনার পরবর্তী দুটি সমিল ৬/৬ চরণে বন্যার চিত্র; দু'টিই ধ্বংসের বার্তাবহ, তবে খরা ও বন্যার দুই প্রান্তিক ভয়াবহ পরিস্থিতি বাংলাদেশের প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিকোণকেই উচচকিত করছে। তৃতীয়াংশে—

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
 মেলাবেন।

ব্যক্তি ও সমষ্টির সংগ্রাম, সাধনা ও সুনামের পাশে ক্ষুধা ও ক্ষুধার পরিণামের সীমা-হীনতায়ও জোর পড়েছে। চতুর্থাংশে তাই "জীবন" এবং "জীবন-মোহের" দ্বন্দ্বের পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভাষাহারা সাধারণ মানুষের বুকে জীবনস্বপ্নের বিদ্রোহী জাগরণ।

জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
  মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

"মোহ"-"বিদ্রোহ" মিলের নবত্ব ছাড়াও প্রথম চরণের ৬/২ এর পর দ্বিতীয় চরণের ৬/৬/২ প্রয়োগ "বিদ্রোহে"র সচলতার গতিস্পন্দ জাগায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম অংশে একাকী বিহঙ্গের আপাতঃ অকারণ বহু বর্ণিল পাখার চঞ্চলতা ও নিষ্প্রাণ জীবনধারণের চিত্র;

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়িয়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
 —মেলাবেন।

ষষ্ঠ অংশে মানবিক ও সার্বিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সুর-বেসুরের স্বীকৃতি :

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
  মেলাবেন।

সপ্তম অংশে আবার পৃথিবীর ধুলো এবং সাধারণ মানুষের অসহায়তার ছবি---

মোটরগাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায় ;
যারা পায়, যারা পেয়েও তবু না পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়---
মেলাবেন ।

অষ্টম অংশে উপসংহার : চাইলেও পরিবর্তন আসছেনা ।

দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচিয়ে পুণ্যের পথে হাঁটা
সমাজ ধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

আপাতঃদৃষ্টে মনে হয় : বৈপরীত্য নিয়েই বিশ্ববাসী মানুষের দৈনন্দিনতা এবং সুধীন্দ্রনাথ আকাঙ্ক্ষিত এ্যারিস্টটলের "গোল্ডেন মীন" নয় বরং যেন বিপরীত উভয়ের সহাবস্থান আধুনিক মানুষের প্রতিদিনের বাস্তব। অসঙ্গতিই মুখ্য, প্রবলতাই "মেলাবেন তিনি মেলাবেন" চরণে সঙ্গতির প্রত্যাশাও প্রবল, প্রায় বিশ্বাসের ধ্বনি স্বরূপ এই 'তিনি' কে ? যেহেতু অনুক্ত, বুদ্ধদেব বসু এর মধ্যে "আধ্যাত্মিকতা" দেখেছেন ; কেননা বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে আলোচনা শুরুই করেন এই বলে : "সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী"।[৬] আমার মতে, পূর্ব সিদ্ধান্তজাত আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ এনে বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। "দেবতা" ঝাঁটা ধরলেও সমাজ-ধর্ম পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কবির স্পষ্ট অথচ অনুচ্চারিত সিদ্ধান্ত : পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া আর প্রচলিত সমাজের, যার উপমা পোড়ো বাড়ী তার, ভাঙা দরজা মিলাবে না, সমাজ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবু মানিয়ে চলছে মধ্যবিত্ত জীবন। এই মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি কবি স্বয়ং। এবং তিনিই, কখনো মিলবেনা জেনেও মধ্যবিত্ত স্বভাবে "মেলাবেন" প্রত্যাশার অসম্ভব সুতোয় সবকিছু বেঁধে "সঙ্গতি"-র প্রত্যাশী। মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের বৈপরীত্যের এই অসামান্য কাব্যরূপে আধ্যাত্মিকতা অনুসন্ধান তাই নিতান্তই নিরর্থক। বস্তুতঃপক্ষে আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতিই এই কবিতার গৌরব। নিঃসন্দেহে এই কবিতা বক্তব্যে, গঠনকৌশলে, মিতভাষিতায় ও ছন্দপরীক্ষায় অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যোৎকর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর সম্পর্ক অজ্ঞাত থাকলে মনে করা যেতে পারত : আজীবন সঙ্গতি-প্রত্যয়ী রবীন্দ্রনাথই এই কবিতার 'তিনি' এবং কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি ব্যঙ্গ রচনা। বলাবাহুল্য, সে প্রশ্নই ওঠে না। এই কাব্যের "তিন প্রশ্ন" কবিতায় কবি দিয়েছেন ঋজু উত্তর :

রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন ন্যুইয়র্কের
ষাটতলা বাড়ির ছায়ায়—
কে উচুঁ—উচ্চতা
চূর্ণচূর্ণ হ'লো দৈত্যরাজ্যে, কোটি জ্বলন্ত ডলার—অর্কের

আলো-নেভা কালো ছাইয়ে জমলো তুচ্ছতা।
গান জেগে রইল মহাকালের মায়ায়
—চৈতন্যের শুভ্র স্তম্ভ কবির উদ্ভাবন। (ক. স. ১, পৃ. ১১৪)

"দূরযানী" (১৩৫১) তে আছে নানা অবলোকন ও অন্বেষণ, আছে ভাষা ও ছন্দের, মিল-অমিলের পরীক্ষা।

"পারাপারে" (১৩৬০) 'বিচিত্র বিদেশের আবহ'। এ কাব্যে আছে কয়েকটি সুন্দর লিরিক :

১. তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল
ফুলে নেওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরলো হৃদয় তল—
একলা বুকে সবই মেলে।। (বিনিময় ঐ পৃ. ১৮৩)

২. আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে-জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ নয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
(চিরদিন, ঐ, পৃ. ২৩২)

৩. আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যাস্ত মধুর চলা
স্তব্ধ শুধু চলার কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ-ভুবন ভ'রে রাখুক
আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ধূলোর রেণু মাখুক।

ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে
কে জানে প্রাণ আনলে কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নিচু—
আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দুদিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।।
(পিঁপড়ে, পৃ. ২৪৫-৪৬)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পয়ারেই ফুটেছে গীতলতা এবং প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃতিতে এসেছে স্বরবৃত্ত প্রয়োগে উৎকর্ষ।

তবে এ কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি কবিতা পঞ্চাশের মন্বন্তর-কেন্দ্রিক : "অন্নদাতা", "অন্নদাও" এবং "১৩৫০"। তিরিশের অন্য কোন প্রধান কবির রচনায় এত

বলিষ্ঠভাবে এ প্রসঙ্গ ধরা পড়েনি।[৭] যে-কৃষক অন্নদাতা সে-কৃষক মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে এসেছে কলকাতার ফুটপাথে। কবির প্রশ্ন :

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মো না কিছু অন্ন
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য ? (ক. স. ১, পৃ. ২১১)

নগরের স্বরূপ উন্মোচন করছেন কবি :

বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ ক'ষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্র চাকায় পিষ্ট, দরদী-নাগর :
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শানবাঁধা কলকাতা। (ঐ, পৃ. ২১১)

এই নগরে অন্নদাতা কৃষকের আসার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।

কবির আবেদন :

গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
একলাখ হ'য়ে মাঠে নদী ধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে-সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ-দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা। (ঐ, পৃ. ২১১-১২)

"অন্নদাও" কবিতায় সরাসরি উচ্চারণ :

সোনার বাঙলা শূন্যে তাকায় : অন্ন নেই।
ভাঙা ভাণ্ডারে মাটি নিরন্ন।

অন্ন আছে,
লোভের মরাইয়ে ধ্বংস গোলায় অন্ন আছে
পণ্যরাষ্ট্র জানে ভুবনের অন্নের পথ।
সে-পথ বন্ধ। (ক. স. পৃ. ২১২)

লক্ষণীয় এই সব কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় অলঙ্কার নিষ্প্রয়োজন হয়েছে, কেবল ছন্দের ক্ষিপ্রতা উজ্জীবিত করেছে ক্ষোভ।

"পালা-বদলে" (১৩৬২) আবার কবির বিশ্বপথিক চিত্ত নীড়সন্ধানী :

১. আজো কোন খুঁজি বাসা,
এদিকে পঞ্চাশ হ'লো, দিন
এ-যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সঙ্কিক্ষণে হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পালা-বদলের বেলা,
(এপারে, কবিতা সংগ্রহ ২, পৃ. ৫)

২. আন্তর্জাতিক মন শিকড়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে
যে-মাটি এ-বুকে আজো বাংলা পার্থিব,
(সংলাপ, ক. স. ২, পৃ. ১২)

৩। কোন পথিকের নাম এই ঘরে বাঁধো।···
আসা আর যাওয়া শেষ করা
ঘরে-ফেরা দিন।
(আরুণি, ক.স. ২, পৃ. ২৫, ২৬)

পরের কাব্য গ্রন্থের নামই "ঘরে ফেরার দিন" (১৩৬৮)। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত এই কাব্য কবি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে; এটি দ্বিতীয় উৎসর্গ। এই কাব্যে প্রথমবারের মত অনেক কবিতায় রচনাস্থান ও বছর (কখনো মাস) উল্লেখ করছেন কবি। অর্থাৎ উল্লেখিত হচ্ছে তাঁর ভ্রমণ পথের নানা স্থানের নাম: কখনো আফ্রিকার, কখনো উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার, কখনো ইউরোপের, কখনো কোন মহাসাগরীয় দ্বীপের। কোন কোন কবিতায়, যেমন "হৃদয় তুমি" বা "ভ্রমণ" কবিতায়, প্রবাস-পরিবেশ মানিয়ে নিতে চাইছেন; "সর্বদেশী" এরকম একটা বিশেষণও ব্যবহার করছেন। অধিকাংশ কবিতাতেই এক ধরনের অতৃপ্তি আছে। উল্লেখযোগ্য উচ্চারণ শুনি "প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে" :

"তগিস্রের কমিসার, সারি বন্দী জীবন্ত রব্যোরা
কুচ-কাওয়াজ, অম্বুবাচি, গুরু-ভক্ত থাক শালগ্রামী
আপ্তবাক্য মনু কিংবা মার্ক্‌স্‌-এর বক্ষ র'ক জুড়ে
—দেশে-দেশে অগ্নিময় শেষ ক্রোশ পেরোনোর দীক্ষা।

"অবজ্ঞাত আমরা চাই ভবিষ্য গড়তে, প্রতিবেশী
চাইনে আমরা চীনে লড়তে, এশিয়া-আফ্রিকা-য়ূরোপে
কী ক'রে প্রবল শক্তি সখ্যতা ফেরাবো, পরীক্ষায়
বাকি কটা পাঁজরা দেব বন্ধক, মৃত্যুঞ্জয় শিক্ষা।
চেরি কি কোকিল গাছে, নার্সিসস্‌ বকুল, স্নো-ড্রপ,
দু-শো গাড়ি কিংবা দশ, উচ্চ-গ্রীব বাড়ি কি এক-তলা,
যেখানেই থাকি আমরা যে-দৃশ্যে, জনতা কিংবা একা,
মানুষ সর্বত্র আমরা ভাববো আজ এলো যুগ-রাজ্য।।"
(ক. স. ২, পৃ. ১১৫)

এই কাব্যের পাঁচ বৎসর পর প্রকাশিত হয় "হারানো অর্কিড" (১৩৭৩)। কবি প্রথম তাঁর কোন কাব্যে একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য ভূমিকা যোগ করেন;

জগৎজোড়া দুঃখের দিনে কিছু কথার ছবি, কল্পনার রঙিন সাক্ষ্য নিয়ে দূর থেকে বাংলাদেশে উপস্থিত হলাম। জানি, কবিতার গীতপরিচয় আজ যথেষ্ট না মনে হ'তে পারে। অথচ শিল্পের ধর্ম শিল্পিত হওয়া : ভাষার শ্রুতি। তীব্র ঘটনার যোগে লেখকের বিশেষ প্রতিশ্রুতি তা-ও লিরিকে ঢাকা রইলো, নতুন বাংলার পাঠক-পাঠিকা ধ্বনির সংগে সেই বেদনাকে বিদ্রোহী মানসে মিলিয়ে দেখবেন। ...

বই এর নাম 'হারানো অর্কিড'। শিকিমে অপর্য্যাপ্ত গিরিসংকট এবং শীততুষারকে পরাস্ত ক'রে অবর্ণনীয় অর্কিড-পুষ্পের বিস্তার; গ্যাংটকে হিমালয় পরিবেশে দেখেছি সেই অপ্রতিহত বীর্যের প্রতীক। আনন্দলহরী। কোন শক্তির সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করে। আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পড়েছিলো অনিন্দ্য-সুন্দর বিজয়ী অর্কিড, গাছের ডালে জড়ানো, বর্বর সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে। কোনোদিনই হারাবে না। পশ্চিম দেশের ফুলের দোকানে দেখেছি নানাদেশী অর্কিড কিনে কত যত্নে লোকে বাড়ি নিয়ে যায়, হৃদয়ে তারুণ্য জাগিয়ে রাখে।
(ক. স. ২, পৃ. ১২৫)

এই কাব্যে সমকালের বিশ্বের নানা সংকটের হ্রস্বদীর্ঘ প্রতিধ্বনি বেজেছে; আছে "সাইগন-জঙ্গল যুদ্ধ" (পৃ. ১৬০) প্রসঙ্গ, আছে ষাট দশকের মার্কিন ক্যাম্পাসে ছাত্র-বিক্ষোভ, "আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদলের মিছিল"। এই কাব্যের "সর্বনাম" বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' কাব্যনাট্যের অভিনয় পরিবেশ থেকে "সর্বনামে"র শুরু। এ নাট্যকাব্য বিশ্বময় যুদ্ধ ও হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উচ্চারণ। বর্ণনার দুটি অংশ :

১. আঁধি ঘনতর। চতুর্দিকে জনতা বিরাট আকাশ-ফিল্মের দিকে তাকিয়ে। দূরে জ্ব'লে উঠল হ্যানয়-সায়গন। দিগন্তে মানুষের হাহাকার। কাদের কীর্তি। যেমন পুড়েছিলো ঈজিপ্ট, কোরিয়া, তিব্বত। সেদিন সাইপ্রাস, আজ স্যান ডোমিঙ্গো। কংগো, রোডেশিয়া। নামের শেষ নেই। বর্বরতা নামলো শুভ্র হিমালয়ের দরজা ভেঙে। (ক. স. ২, পৃ. ১৭১)

২. ওরাই ফিরে আসবে। পুরোনো রাস্তায় নয়, নতুন ধর্মে। সর্বনামের দল, এদের বহু নাম, বহু দেশ। কিন্তু চিনতে বাধে না দরাজ মার্কিনে, খাঁটি বাংলায়----ভারতে, কোন যথার্থ স্বদেশে। বুড়ো রাষ্ট্রিকেরা পাপ দিয়ে পাপ লড়ে, ধ্বংসের ব্যাপারী। কিন্তু এদের নব্য বৃত্তি : মানুষের স্বীকৃতি। রোধবার শক্তি, বাঁধবার কল্যাণে। কেউ বাদ পড়ে না। অদ্ভুত মিশ্রধর্মের অঙ্গ অন্ন-বস্ত্র-ওষুধ, চাষ-করা, বই-পড়া; জাত-না-মানা, ব্রিজ বানানো। বাড়ি পোড়ানো নয়, গৃহদীপ জ্বালা, আগুনকে আলো করা। বীর্যসংঘ। (ক. স. ২, পৃ. ১৭৩)

এই কাব্যে কয়েকটি সুন্দর লিরিকও মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১. পরেছো যে কানে ঝলক-দোলানো
হীরে-কাটা ইয়ারিং—
বুকে তারি ধ্বনি পুলক-বোলানো—
বাজে ডিং ডং ডিং!
মায়ামুদ্গর তত্ত্ব মানিনি
প্রাণ সে তো নয় শুকনো পাণিনি
লট লুট বিধিলিং

প্রেমে রঙে শুধু একটি কাহিনী,
নয় ঋষি ঋং শৃং—
চমক তোলানো
বাজে রোদে ডং ডিং।
(লিরিক, ক. স. ২, পৃ. ১৫৩)

২. ভালোবাসার বদলে আর কী বলো যায় দেয়া,
কেবল ভালোবাসা—
সব-হারানো সব-পারানো ভাষায় ভরা ভাষা
চোখের জলে ভাসা গো
স্বর্গ বেলায় স্বর্গ-দেয়া-নেয়া।
(গান, ক.স. ২, পৃ. ১৫৪)

৩. কাকে চাই তা জানি যখন দেখি তোমার মুখ,
যখন তোমার গলার আওয়াজ শুনি
---তোমাকে চাই।
ভরে যখন তোমায় ছুঁয়ে সমস্ত বুক,
কানায়-কানায় হাওয়ায় লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী—
তোমাকে পাই ॥
(ধুলোর ঘরে, ক. স. ২, পৃ. ১৫৮)

উদ্ধৃত পংক্তিমালায় চরণ সজ্জায় যে বৈচিত্র্য কবি সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য-যোগ্য। মিলের মধ্যেও রয়েছে আপাতঃ অনায়াস কিন্তু যথেষ্ট সতর্ক পরীক্ষা। প্রথম উদ্ধৃতির এগারো চরণে এসেছে তিনগুচ্ছ মিল। চরণ সংখ্যা ১,৩ ও ১০এ "দোলানো", "বোলানো", "তোলানো" ; ২,৪,৭,৯ ও ১১ চরণে "ইয়ারিং", ডিং ডং ডিং", "বিধিলিং", "ঋং শৃং"ও "ডং ডিং" এবং মধ্যবর্তী ৫ ও ৬ চরণে "মানিনি", "পাণিনি" মিল তার প্রমাণ। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির দু'টি মিল : প্রথম ও পঞ্চম চরণে এবং ২, ৩ ও ৪ চরণে। তৃতীয় উদ্ধৃতির মিল ১/৪, ২/৫, এবং ৩/৬।

"পুষ্পিত ইমেজ" (১৩৭৪)-এও এই লিরিকের প্রলম্বন। এটি কবির হ্রস্বতম গ্রন্থ, কবি পরোক্ষে বলেছেন, 'প্রেমের কবিতা'। "পরিচয়ে" বলেছেন, "লৌকিক পদাবলি, প্যাস্টোরাল, পুরোনো এলিজাবেথান্ লিরিক এবং আধুনিক প্রত্যক্ষ ও প্রতীকে মিশিয়ে কিছু সাময়িক প্রেমের কবিতা গেঁথেছি—সঙ্গে রইলো। একটি স্বল্প আখ্যায়িকা এবং একটি বিশেষ লিরিক অবলম্বন ক'রে নাম রাখলাম "পুষ্পিত ইমেজ"। বসন্তের সদ্য স্নো-গলা মুগ্ধ মাটি, নতুন সূর্যরশ্মি পশ্চিম হৃদয়রাজ্যে ফিরে এলো, শীঘ্রই দেখা দেবে অগণ্য পুষ্পাঙ্কিত মে মাসের অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য। তারই আবাহন জানাই।"

চিত্রকল্প মার্কিনী ও আন্তর্জাতিক পরিবেশজাত। আছে ওহায়ো, বোস্টন, আছে পিৎসার দোকান; দূরত্ব বোঝাতে---"দূর নয়, দুটো ব্রিজ পাঁচ ব্লক বাড়ি"। হারানো অর্কিডের সঙ্গে তুলনীয় কোন পংক্তি এ কাব্যে নেই।

"অমরাবতী" (১৩৭৯)-র "পরিচয়ে" কবি লিখেছেন :

"'বিশেষ প্রসঙ্গিত অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রে গাঁথা রচনা বাদ দিইনি। যাঁদের চরিত্র মহান জেনেছি, এমন কি স্থান-মাহাত্ম্য যেখানে জনালয়ে বা বিজনতায় আমার নিবিড় চৈতন্যে মিশেছে কাব্যে তা স্বীকার করেছি।

প্রথম কবিতা "তীর্থ-পত্র"। পথিক কবি আত্মপরিচয়ে বলছেন—

প্লেনের ট্রেনের গোরুর গাড়ির
যাত্রা একই, সবার বাড়ির
বৃহৎ ধারায় সংসারে যাই—
—ঘোরাঘুরির ছন্দটা তাই।
আমেরিকায় বাঙালি প্রাণ
পাহাড়তলির পাঠাই সে-গান
(ক.স. ২, পৃ. ২০০-২০১)

"মানুষের কথা বোলো না" কবিতায় প্রথম আসছে "বীটনিক" আর "রক এণ্ড রোল" প্রসঙ্গ। কবিতাটি লেখা সমুদ্র দ্বীপ—স্টার আইল্যাণ্ড্-ভ্রমণের সময়।

দ্বীপে এখন নতুন হাওয়া
তন্বী হোটেল গাছে-ছাওয়া
মোটর বোটে শব্দ ছোটে
বীট্‌নিকেরা মেতে ওঠে
প্রলয় তোলে রক্-এ্যাণ্ড-রোলে
—এদের কথা বোলো না— (ক. স. ২, পৃ. ২০৯)

ভিয়েৎনাম যুদ্ধকেন্দ্রিক মার্কিন ক্যাম্পাসের বিক্ষোভের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী নিজেকে জড়িয়েছিলেন। বস্টন থেকে ২৫ মার্চ ১৯৬৮ তারিখে লেখা এক পত্রে অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন :

দুঃখী, পরাক্রান্ত, তীব্রবিপন্ন ভিয়েৎনামবাসীদের বেষ্টন ক'রে অশ্রুশীলা নদী—তারাই আবার তীরে তীরে জীবনের করুণা ফিরিয়ে আনবে। সেদিন পৃথিবীতে থাকব না। সাংঘাতিক হেলিকপ্টার-চড়া বীর ঘাতকদের বিক্রম চীৎকার এবং আহত শ্রমিকদের নিষ্ফল শোক দেখে গেলাম। নানাভাবে ভিয়েৎনামের জন্যে কিছু কাজে নিযুক্ত আছি। N. Y. Times-এ সে বিষয়ে খবর আছে,···[৮]

১৯৬৭ সালে লেখা "অমরাবতীর" 'মার্কিনে দানব' শীর্ষক দুটি ছড়া-জাতীয় রচনার একটিতে কবি লিখেছেন—

এক হাতে ওর গাজর আছে, আর এক হাতে বোমা—
গাধার বাচ্চা চমকে বলে, ওমা।
(ধনপতির রঙ্গ দেখে ভয়ে-ভয়ে হাসে)
(গণপতির চোখে চাবুক, চাতুরি আশ্বাসে)
(রণপতির বিশ্বনেশা ঘিরলো ভুবন ত্রাসে)
গাধার অতো বুদ্ধি তো নেই। কি হল জানো, মা ?
অতিবুদ্ধির ব্যাপার দেখে প্রায় হ'লো তার কোমা।
গরিব মানুষ, মাঠের মানুষ, বোঝো এই উপমা।।
(১ বোমারুর আশ্বাস, ঐ, পৃ. ২০৫)

এই গ্রন্থের "বাংলার ডায়েরি" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কবিতা। কবির সংযুক্তি সুপ্রত্যক্ষ। কবিতার উপসংহারে স্বাধীন বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন কবি : বলছেন—

গ'ড়ে তুলবো ভাঙা ঘর, সর্বহারা জনতাজীবন,
পৃথিবীর বায়ু আয়ু রঞ্জিত প্রাণের মহাবলে
বাজাবো মুক্তির শাঁখ। (ক. স. ২, পৃ. ২২৪)

কবির এযাবৎ প্রকাশিত শেষতম কাব্য ''অনিঃশেষ'' (১৩৮৩)-এ বাংলাদেশ শীর্ষক আর একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটি ১৯৭১ সালের রচনা—মুক্তিযুদ্ধ তখনো চলছে। কবি বিশ্ববিবেকের কাছে আবেদন করছেন, বাংলাদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার আহ্বান জানাচ্ছেন; প্রশ্ন তুলছেন—

চরম যন্ত্রণাক্ষণে বাংলাদেশে লোকায়ত যারা
ভবিষ্যৎ গড়ে তারা বিশ্বে আজ হবে অস্বীকৃত?
(বাংলাদেশ, ক. স. ২, পৃ. ২৪২)

এ কাব্যে ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ পুনরায় এসেছে:

হে মেকং: জানি আজ অদূরে পল্লীতে শহরে
বোমারু শকুনি যত ঝাঁকে-ঝাঁকে মৃত্যু আনে ঘরে,—
নৃহত্যার পক্ষাঘাতে শেষ পালা ওদেরি উড্ডীন—
সারা ভিয়েৎনাম জুড়ে জয়ী শঙ্খ বাজবে সেদিন।
(ত্রয়ী স্তোত্র, ক. স. ২, পৃ. ২৩৩)

আমেরিকায় ব্যক্তিমানুষের মহত্ব যেমন কবি দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও আদিবাসীদের দুর্দশা। ''মাটির ডেরা'' কবিতায় লিখেছেন:

উত্তর আসছে নতুন ব্যবসায়ীদের লুব্ধজালেধরা ওদের লাঞ্ছনায়;
লণ্ড্রিতে, ক্ষুদে হোটেলে, জুতো-পালিশে, ওদের জাতীয় অন্তর্ধান;
এদিকে জমি, সম্পত্তি ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছে
মধ্যস্থ মনিবদল —চাতুরীর রাষ্ট্র,
দেখো, অনিবার্য আসন্ন
প্রকাণ্ড আমেরিণ্ডিয়ান্ মৃত্যু॥ (ক. স. ২, পৃ. ২৫৭)

''কালের পুতুলে'' বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তীর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন: এক. তাঁর আধ্যাত্মিকতা[৯]; আর দুই. রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাদৃশ্য।[১০] প্রথমটি ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী গ্রাহ্য মনে করেননি[১১]; অমিয় চক্রবর্তীর কবিভুবনের যে পরিক্রমা এখানে তুলে ধরেছি তার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা মুখ্য কোন প্রসঙ্গ নয়। দ্বিতীয়টি বুদ্ধদেব বসু নিজেই খণ্ডন করেছেন, বলেছেন—''মূলতঃ এক হলেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র''[১২]। এই ঐক্য কেবল বিশ্ব প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীও শেষ পর্যন্ত আশাবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র এবং তাঁর প্রকাশরীতি, ভাষা ও ছন্দ অনায়াসে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ফ্রস্টের প্রভাবের কথা—''কোথাও কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে''—উল্লেখ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু—('কবিতা' পৌষ ১৩৬২, ক. স. ২, পৃ. ৩২১)। আমার মনে হয় এও এক দ্রুত সিদ্ধান্ত। অমিয় চক্রবর্তী বিশেষ করে 'পারাপারে' কাব্যের ''ছড়ানো মার্কিনী'' অংশে আমেরিকার পরিপার্শ্ব ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ফ্রস্টের নয়। অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকায় সব সময়ই প্রবাসী। একবার লিখেছিলেন—

I am a Bengali living abroad, carrying a load of
sorrow at heart
I look at the morning sun and see the day is overcast
with tears[১৩]

তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবি ডক্টর জগন্নাথ চক্রবর্তী যে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য মনে করি—অমিয় চক্রবর্তী writes his poetry, it would seem, not on a paper but on a sheet of World map.[১৪] যেমন কবিতায় এসেছে বিচিত্র ভৌগোলিক নাম, তেমনি কবিতার রচনাস্থানের নাম ও কত বিচিত্র তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ঐ প্রসঙ্গে কবি নরেশ গুহকে লেখা এক পত্রে (১৯৭৬) কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন :

আমার নিজের বিশ্বাস ছবির ফ্রেমের মতো স্থান, সময় ইত্যাদির প্রসঙ্গ কবিতার একটি বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করে : ছোটো জিনিষের সঙ্গে বড়োর তুলনা করলে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ সাংঘাইয়ে 'খর বায়ু বয় বেগে' লিখেছিলেন—একটি চীনে সাম্পান উত্তাল ঢেউ, ঝড় অগ্রাহ্য ক'রে মহাসমুদ্রে দূরে চলে গেলো—এই ছবিটা মনে আনলে তাঁর ঐ গান বা কবিতার ক্ষতি নেই। আনমনা অথচ বেপরোয়া এবং অনিবার্য একটি ভাবের বৃদ্ধি অনুভব করি। জিনিষটাকে বাড়িয়ে বলতে চাইনা, পারিপার্শ্বিকের প্রতি আসক্তি হয়তো ব্যক্তিগত স্মৃতির খেয়াল, মমতায় ঐতিহাসিক। কিন্তু 'পূরবী'র কবিতায় জাহাজের নামগুলিও আমার মনে প্রাসঙ্গিকের ঢেউ তোলে। 'ও আমার জুঁই' বুয়েনোস্ আইরেসে লেখা হয়েছিলো—এতে জুঁই ফুল আরো যেন হৃদয় ভ'রে আসে। 'ক্ষত যত ক্ষতি যত' গানটা গ্রীসের পটভূমির কাছে ব'সে লেখা শাশ্বত অরুণোদয়ের সম্মুখে, অনেক গান জর্মানিতে এবং য়ুরোপের অন্যত্র চলার পথে রচিত, তার ইঙ্গিত পেলে ভালোই লাগে। আবার বলি, আমার কবিতার কোনো আকস্মিক দাম-বাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়—গ্রেনাডিন দ্বীপে নারকলগাছগুলি কীভাবে আমাকে ডাক দিয়েছিলো, ভারতীয় মন নিয়ে সেই পশ্চিম ইণ্ডিস দ্বীপে তা চমকিয়ে বুঝেছিলাম। শুধু একদিনের মেয়াদ, তার পরেই বিদায়। সেই দ্বীপ থেকে চিরদিনের মতো চলে আসার ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে অসীম বেদনা জাগলো ; সমুদ্রঘেরা বিশেষ দ্বীপের স্মারণিক চিহ্ন রাখতে চেয়েছিলাম। অবশ্য সবই ধুয়ে-মুছে উনত্রিশ পবনে উড়ে হারিয়ে যায়, কবিতাও তথৈবচ। ···জানি যে, অনেকে এই স্থান-সনের উল্লেখকে দাম্ভিকতার পরিচয় মনে করেন। হতে পারে, কিন্তু কবিতা লেখাটাই একদিক থেকে দাম্ভিকতা, ইতিহাসরক্ষার বৃত্তিটাও আত্মম্ভরিতা। কিন্তু শুধু তাই নয়।[১৫]

বিশ্বপথিক অমিয় চক্রবর্তীর কবি চৈতন্যের মূলে রয়েছে পৌনঃপুনিক ঘরে ফেরার অনুপ্রাণিত আকাঙ্ক্ষা। 'অমরাবতীর' "আঁচল" কবিতায়, মিতভাষিত পংক্তিমালার সহজ মিলে, সেই আকাঙ্ক্ষার সুর উচচারিত হয়েছে :

কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল,
বসুমা, তোমার আঁচল
এখানে বিছাও—
মাথা রেখে শোবো আর দেখবো উধাও

মেঘে মেঘে চলে নীলাকাশ ;
শেষ ক'রে দূর পরবাস
ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে,
মাটি, তুমি নাও বুকে মেলে ।। (ক. স. ২, পৃ. ১২৫)

নিজের কাজের কথা বলতে গিয়ে ''কৈফিয়ৎ'' কবিতায় কবি লিখেছেন :

কিছু না করেও যারা মিছে হয়রান
দেখ আমি আছি সেই বলবান
দলে—
চারিটি ঘণ্টা ধরে পুঁথি লেখা ছলে
চেয়ারেই গুনি প্রাণ, মৃত্তিকা আসমান
চোখে দোলে ভাসমান ;
পাতা খোলা অভিযান
টেবিলের তলে।
জীবন-দিনটা তবু যায়নি বদলে—
শুনেছি অবাক কথা, তিব্বতী উদ্বেগ
পাড়ায় চলেছে নাম-
সংকীর্তন
গাছে ঢাকা ক্ষুদে গ্রাম
মনের মতন।
শুধু আছি, তার বেশি হলে
বৃথা শ্রম, অনীহার পড়িনি কবলে।

'বৃথা শ্রম' নয় ; অমিয় চক্রবর্তী সফল শ্রমেই প্রকরণে সিদ্ধিলাভ করেছেন। সত্তর উত্তীর্ণ বয়সে এখনো যে তিনি নিরীক্ষাপ্রিয় এবং অনলস—সে তাঁর সচেতন মনেরই প্রতিচ্ছবি। ভিয়েৎনাম ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা তাঁর কবিমানসের শক্তিকেন্দ্রকেই নির্দেশ করে।

তথ্যনির্দেশ

১ ''নামা—ওঠা'', 'খসড়া', 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড, ১৯৭৭, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮
২ ''কালান্তর'', ঐ, পৃ. ৯
৩ ''কালো জল'', ঐ, পৃ. ১৫
৪ ''পুষ্পদৃষ্টি'', ঐ, পৃ. ১০
৫ ''পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শ্রীচরণেষু''
৬ বুদ্ধদেব বসু, ১৯৪৬, 'কালের পুতুল', নিউ এজ সংস্করণ ১৯৫৯, পৃ. ৯৯
৭ এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'অন্নদাতা' ফোল্ডারের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যামিনী রায়।

৮ অমিয় চক্রবর্তী, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৯, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২৭

৯ বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

১০ ঐ, পৃ. ৯৯

১১ দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৫৮, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', কলকাতা, নাভানা, পৃ. ৩৩৩

১২ বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১৩ উদ্ধৃত, Jagannath Chakravarty, 1968, Amiya Chakravarty, in Ghose, Nirmal, 1968, *Studies in Modern Bengali Poetry*, Calcutta : Novela.

১৪ জগন্নাথ চক্রবর্তী, ঐ, পৃ. ৭৪

১৫ নরেশ গুহ কর্তৃক উদ্ধৃত, কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১৭